মাইকেলই প্রথম জানান বাংলা একটা মহাভাষা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

মাইকেলকে নিয়ে আমাদের অনেকের বিড়ম্বনার শেষ নেই, গর্বেরও শেষ নেই। কেন তিনি বাবা মা'র অমতে তাঁদের দুঃখ দিয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হলেন, সেই শ্রীমধুসূদন থাকলেই তো হত। ধর্মত্যাগ কি ভাল কথা? আরেক দল বলেন তা হোক তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করেছেন। ধর্মনিষ্ঠ কত হিন্দুই তো ছিল। তারা তো কেউ 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখেনি। 'কৃষ্ণকুমারী'র মতো নাটক, 'চতুর্দশ কবিতাবলী'র মতো সনেট তো বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম লিখেছেন। তাঁদের মতে ধর্মটা আসল নয়, আসল হচ্ছে কর্ম।

বিদ্যাসাগরও ধর্ম মানতেন না

বিদ্যাসাগরও ধর্ম-টর্মের কথা বলতেন না; তাঁকে দানসাগর বললে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু জীবনে মন্দির বা মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটা পয়সা দেননি। কাশীতে পাণ্ডারা তাঁকে বিশ্বনাথের নামে টাকা দিতে বললে বলেছিলেন, বাবা-মাই আমার সাক্ষাৎ দেবদেবী। বিশ্বনাথ মানি না। তাতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগর হতে বাধেনি। দুশো বছর বাদেও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যা বা জ্ঞানকেই তিনি ইষ্ট মেনেছেন। সারা জীবন জ্ঞানের চর্চা করেছেন। জ্ঞানকে প্রসারিত করার জন্য ৮৮টা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়বে এমন সুচিন্তিত সুন্দর সুন্দর বই লিখেছেন।

মধুসূদন বন্দনা করেছেন কাব্যদেবীর

মধুসূদন তেমনি বন্দনা করেছেন কাব্যদেবীর। লিখেছেন,

'আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেত ভুজে
ভারতি... ঊরি দাসে দেহ পদছায়া।'

তিনি স্রষ্টা; নতুন নতুন কাব্য, নাটক, প্রহসন, সনেট লিখতে চান। কাব্যসরস্বতীকে জননী সম্বোধন করে তিনি তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। আহ্বান করেছেন কল্পনা শক্তিকে।

'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু

লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

গৌড়জন মানে বঙ্গভাষী মানুষ। এমন কাব্য তিনি লিখবেন যা পাঠ করে বাংলাদেশের মানুষরা আনন্দিত হবে। আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। মাইকেলের কাব্য পাঠ করার সময় বাঙালির কি মনে থাকে তিনি হিন্দু ছিলেন কি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? ধর্মের কথা তারাই সব সময় মনে রাখে যারা জ্ঞানের আলো থেকে দূরে, যারা সাহিত্য শিল্পের সৌন্দর্য আস্বাদ করতে পারে না। মানুষ মহান হয়েছে বহু বিচিত্র জ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে, মানুষের জীবন সুন্দর হয়েছে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলার প্রকাশ সৌন্দর্যে। যারা প্রকৃত জ্ঞানী বা জ্ঞানসাধক তাদের ধর্ম পরিচয়টা গৌণ।

কীর্তি পরিচয়ই আসল, ধর্ম পরিচয় নয়

ধর্ম পরিচয় জন্মসূত্রে পাওয়া। এটা পারিবারিক অভিজ্ঞান মাত্র। মানুষ হিসেবে সামাজিক পৃথিবীতে অবদানগত পরিচয় রাখতে হয় কর্মসূত্রে। কীর্তিমান মানুষই আসল মানুষ। কীর্তি পরিচয়ই তার আসল পরিচয়। কীর্তি যস্য সঃ জীবতি। সেই কীর্তির স্বাক্ষর একজন জীবনের নানা ক্ষেত্রে রাখতে পারেন। কেউ রাখেন জ্ঞানের জগতে, কেউ শিল্প সাহিত্যের জগতে। মাইকেল এক অসামান্য কবি, মহাকবি। তিনি তার সৃষ্টির ভুবন ভরিয়ে দিয়েছেন নানা রকম রচনা দিয়ে। আখ্যান কাব্য, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, ট্রাজেডি, প্রহসন, চতুর্দশপদী কবিতাবলী দিয়ে সাজানো তাঁর সৃষ্টি সম্ভার। তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা; তাঁর হাত থেকেই আমরা পেয়েছি বাংলায় প্রথম মহাকাব্য — মেঘনাদবধ কাব্য; তিনিই আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রথম সার্থক ট্রাজেডি — কৃষ্ণকুমারী; সনেট নামক কাব্যিক রূপবন্ধটি তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন বাংলায় — চতুর্দশপদী কবিতাবলি। বাংলা ভাষায় যে এত রকম সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল কে জানত? হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে তিনি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, পরিবর্তনকে তিনি নিয়ে এসেছেন 'ঝড়ের পিঠে'। ঠিকই বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের এত বড় প্রতিভাকে যাঁরা তাঁর ধর্ম পরিচয় দিয়ে ব্রাত্য করে রাখতে চান তাঁরা না জানেন প্রতিভার মর্যাদা, না জানেন সাহিত্যের আনন্দলোকের খবর, না জানেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস।

সাহিত্য হচ্ছে ভাষায় প্রকাশিত জীবন

সাহিত্য কী? সাহিত্য হচ্ছে ভাষায় প্রকাশিত জীবন। মানুষ শুধু বেঁচে থাকতে চায় না, সে জানতে চায়, সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। বেঁচে থাকার জন্য ক্ষুধার অন্ন আর যৌনতা চরিতার্থ করার জৈবিক শরীর পেলেই চলে। এখানে অন্যান্য প্রাণীও যা মানুষও তাই। পশুকুলের সঙ্গে এখানে মানুষের তফাৎ কিছু নেই। ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য লাগে বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধির চর্চা ক্রমশ মানুষকে উন্নততর প্রাণীতে পরিণত করেছে। কেজো জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে কার্য-কারণের রহস্য ভেদকারী বিচিত্র ধারার জ্ঞানের চর্চায় মানুষ প্রাণীকুলকে ছাপিয়ে গেছে। উন্নততর মানুষ উন্নততম হয়েছে হৃদয়বৃত্তির ঋণে। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ক্রোধ, বীরত্ব, ভীতির অনুভূতিকে সম্যকভাবে প্রকাশ করার জন্য সে সৃষ্টি করেছে চিত্রকলা, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য। মানুষের সুকুমার

অনুভূতির নানা রূপ, নানা রং। সেইসব অনুভূতিকে ভাষায়, শব্দমালায় প্রকাশ করার জন্য সে সৃষ্টি করেছে সাহিত্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহিত্যিক। ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের জীবন-রহস্য, তার অনুভূতি ও আবেগের সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ণ অভিঘাত তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার কাব্য-নাটকের মধ্যে। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে; তা হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ। মাইকেল আমাদের বিড়ম্বনার কারণ, না আমাদের গৌরব — এই প্রশ্ন যখন সামনে আসে তখন তাঁর কীর্তির কথাই বড় করে দেখা দরকার। যাঁরা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয়ের মধ্যে মানুষকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চান তাঁরা মানব পরিচয়ের রস-রহস্যই জানেন না। কোটি কোটি মানুষ জন্মসূত্রে কোনও না কোনও ধর্ম-পরিচয়ে পরিচিত কিন্তু মানুষের আসল রূপ ও আসল পরিচয় ফুটে ওঠে তার কীর্তির মধ্যে দিয়ে। যিনি জ্ঞানী, কর্মী, দানশীল, সমাজসেবী, শিল্পী, স্রষ্টা তাঁর ধর্ম পরিচয়টা একটা সামান্য পরিচয় মাত্র। তা দিয়ে তিনি মহানও হন না, ঘৃণ্যও হন না। ধর্ম পরিচয়ের মাটি ফুঁড়ে যে সামাজিক জীবনের আকাশে ডালপালা মেলেনি, পুষ্পিত ও ফলবান হয়ে ওঠেনি তাকে মহীরূহ বলা যায় না। বিদ্যাসাগর বা মাইকেল আমাদের বঙ্গভূমিতে মহীরূহ স্বরূপ। বিদ্যাসাগর প্রচলিত অর্থে ধার্মিক ছিলেন কিনা, মাইকেল পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরের শরণ নিয়েছিলেন কেন? — সে প্রশ্ন তাঁদের কীর্তির গৌরবকে ম্লান করতে পারে না।

ধর্ম পরিচয় জন্মসূত্রে পাওয়া

স্বধর্ম ত্যাগের জন্য মধুসূদনকে দোষারোপ করাটা কোনও কাজের কথা নয়। ঐতিহাসিক বা বিচারকের কাজ খতিয়ে দেখা কেন, কী পরিস্থিতিতে তিনি এ কাজ করেছিলেন আর এই ধর্মত্যাগের পিছনে কোনও সত্যিকার ধর্মীয় আবেগ তাঁকে তাড়িত বা আকৃষ্ট করেছিল কিনা। আগেই বলা হয়েছে মানুষের ধর্ম পরিচয় আসলে তার সামান্য জন্ম পরিচয় মাত্র। যে হিন্দু পরিবারে জন্মেছে সে হিন্দু, যে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মেছে সে খ্রিস্টান, মুসলমান পরিবারে জন্মালে হয় মুসলমান। এর উপর তার হাত নেই। নিজের ইচ্ছা বা অভিরুচি অনুসারে কেউ তার এই জন্ম পরিচয় ঠিক করতে পারে না। হিন্দুধর্ম ভাল বলে কেউ হিন্দু পরিবারে জন্মেছে বা খ্রিস্টধর্ম সর্বোত্তম বলে সে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মেছে — ব্যাপারটা এরকম নয়। জন্মগ্রহণের ঘটনাটাই ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ-নিরপেক্ষ একটা ঘটনা। পাথরের ঢেলা কোনও নদীতে থাকলে সেই নদীর স্রোতের ঠেলাতেই সে গড়িয়ে চলে, সেই নদী থেকে উঠে অন্য নদীতে যাওয়ার সাধ্য তার থাকে না, কিন্তু কর্ম ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রাণী হলে, তার মধ্যে চলিষ্ণুতার জীবনীশক্তি থাকলে, সে সুবিধা অসুবিধা বোধ প্রয়োগ করে পুরনো নদী বা জলাশয় পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে পারে। এটা দেশত্যাগের ক্ষেত্রেও হতে পারে, ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রেও হতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিহাস অভিবাসনের ইতিহাস। এক দেশ ছেড়ে মানুষ অন্য দেশে চলে যায় — আগেও গেছে, এখনও যায়। এক ধর্ম ছেড়ে মানুষ অন্য ধর্ম গ্রহণ না করলে সূচনাকালে খ্রিস্টধর্মের অনুগামী বা ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের সংখ্যা তো আঙুলে গোনা যেত। সব তো তলোয়ারের জোরে হয়নি। বুদ্ধদেব আসার আগে বৌদ্ধধর্ম ছিল? এত লোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হল কী করে? মানুষ আকৃষ্ট হয়ে অন্য ধর্ম ত্যাগ না করলে কি বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বী হত এত সংখ্যায়? সুতরাং ধর্মত্যাগ বা অন্য ধর্ম গ্রহণ নতুন কিছু নয়।

মাইকেল স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন ধর্মের জন্য নয়

ভাল করে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে মাইকেল ধর্মের জন্য ধর্মত্যাগ করেননি। করলে তিনি ধর্ম নিয়েই থাকতেন। গির্জায় তাঁর খুব যাতায়াত ছিল এমত প্রমাণ মেলে না। বন্ধুরা তাঁকে মাইকেল সম্বোধন করে চিঠি লিখলে তিনি বিরক্ত হতেন। খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি মোটেও মাথা ঘামাননি, কিছু লেখেনও নি। অন্তিম কালে তাঁর অন্ত্যেষ্টি কোন মতে হবে তা নিয়ে শুভানুধ্যায়ীরা চিন্তিত হয়ে পড়লে তিনি বলেছিলেন,

> 'আমি মনুষ্য নির্মিত গির্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না... পৃথিবীতলে শ্যাম শষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া থাকে।'

তাঁর নিজের লেখা সমাধিলিপি এখনও আছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে তিনি লিখেছেন,

> 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
> বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
> (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
> বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
> দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন...'

সেখানে কোথাও যিশুখ্রিস্টের করুণার কথা লেখা নেই। বস্তুত আচরণ বা বিশ্বাসগত ভাবে তিনি আদৌ ধর্ম ভাবুক ছিলেন না।

মধুসূদনের কবিমন

বেদনাকাতর নারী হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকে নিয়ে তিনি যখন ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্য লিখেছেন তখন রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছেন : 'Leave aside all religious biasness'। সমস্ত রকম ধর্মীয় অনুষঙ্গের কথা ভুলে যাও। নারীর অন্তর্বেদনার ক্রন্দন কান পেতে শোনো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন তো কী হয়েছে? হিন্দু পুরাণ ও ভারতীয় কাব্যের কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁকে চুম্বকের মত টানে। রাজনারায়ণ বসুকে অকপটে লিখেছেন, 'I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry'। তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'শর্মিষ্ঠা' নাটক, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিষয়বস্তু, কাহিনি ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে সংগৃহীত। যাঁরা মাইকেলের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ নিয়ে অতিমাত্রায় ভাবিত তাঁরা সমস্ত রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বমুক্ত মাইকেলের কবিমনটাকেই চিনতে পারেননি। খিদিরপুরে থাকাকালে মহরমের শোভাযাত্রা দেখে তিনি বন্ধুকে লিখেছেন, হোসেন ও তার ভাইয়ের ট্রাজিক মৃত্যু নিয়ে মুসলমানদের একটি সত্যিকার জাতীয় কাব্য লেখা সম্ভব। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে, পদ্মাবতী নাটকে, বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে, চতুর্দশপদী কাব্যে বিজাতীয় ভাব, বিদেশি ছন্দ, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের স্পষ্ট ছায়া আছে। সেজন্য সাহিত্যবোধহীন ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সমালোচকরা বলেন, নামেই বাংলায় লেখা, বিষয় ভারতীয় হলে কী হবে মাইকেলের লেখা বিজাতীয়ভাবে পূর্ণ। এর উত্তর গৌরদাস বসাককে লেখা এক চিঠিতে মধুকবি নিজেই দিয়ে গেছেন —

> ‘যদি ভাষা শুদ্ধ, ভাবাবেগ হৃদয়গ্রাহী, বৃত্তান্ত আকর্ষণীয় ও চরিত্রগুলি খাঁটি হয় তবে তার বিজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অর্থ হয় না। তুমি কি মূরের কাব্য অপছন্দ কর তার প্রাচ্যত্বের জন্য; বায়রনের কাব্য তার এশীয় আবহের জন্য; অথবা কার্লাইল এর কাব্য তার জার্মানত্বের জন্য?’

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তর ঘটালেন

বাংলা কাব্যের অঙ্গনে তিনি ব্যাস, বাল্মীকি কালিদাসের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়েছিলেন হোমার, ভার্জিল, মিল্টন ও তাসো-দের। মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের অনুরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ; পেত্রার্ক, শেক্সপিয়ারের সনেটের অনুরূপ চতুর্দশ পদাবলি; শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির অনুরূপ ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক, ওভিদের পত্রকাব্যের অনুরূপ ‘বীরাঙ্গনা’ পত্রকাব্য রচনা করে বিচিত্রের এক অপরূপ সমারোহ ঘটিয়েছেন। মাইকেল বাংলা সাহিত্যকে যেন বিশ্বসাহিত্যের পুষ্পোদ্যানে পরিণত করতে চেয়েছেন — বিশ্বের নানা সাহিত্যের পুষ্পোদ্যান থেকে পুষ্প চয়ন করে বঙ্গসরস্বতীর গলে পরিয়েছেন। বাঙালি কবিরা দেবদেবীর মহিমা প্রচারমূলক মঙ্গলকাব্য লিখেছেন অনেক, তিনি লিখলেন মহাকাব্য। বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ছিল না। ঘুমপাড়ানি পয়ার ছন্দের জায়গায় নিয়ে এলেন প্রবহমান গতিশক্তি সম্পন্ন ওজস্বী অমিত্রাক্ষর ছন্দ। বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন যুগ এনে দিয়েছেন। তিনি নবযুগের কবি। আবহমান কালের দৈবীবাদের কারাপ্রাচীর ভেঙে তিনি পুরুষকার নির্ভর মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলা কাব্যের পৃথিবীতে।। তিনি গতানুগতিক সংস্কারের প্রশ্নহীন আনুগত্য ভেঙে বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছেন যেন। জাতি, দেশ বা ধর্মচেতনার সঙ্কীর্ণতা ও গতানুগতিকতার সংস্কার থেকে মুক্ত মন নিয়ে তিনি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ঘটিয়ে দিয়েছেন যুগান্তর।

মাইকেল এসেছিলেন ডিরোজিওর পথে

এটা সম্ভব হয়েছে উনিশ শতকের বঙ্গজীবনে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণে। নানা দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া একটা সভ্যতার প্রতিভূ হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সেই বিশেষ সময়পর্বে যাঁরা মনে করেছিলেন আমাদের দেশের যা কিছু আছে সব ভাল, তার মধ্যেই উটপাখির মতো মুখ গুঁজতে হবে, মাইকেল তাদের কেউ ছিলেন না। যাঁরা মনে করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে আমাদের জীবনে, মননে স্বাগত জানাতে হবে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাদের অনুসারী। হিন্দু কলেজের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের সামনে খুলে দিয়েছিলেন পশ্চিমের দ্বার। সংস্কারবদ্ধ এদেশীয় সামন্ত মানসিকতার অচলায়তনে তিনি করাঘাত করেছিলেন। বলেছিলেন যা আছে তাকে নিঃশেষ মেনে নেওয়া নয়, সবকিছুকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যুক্তি ও মানবতাবাদের কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করে নিতে হবে। তাঁর অনুরাগী ছাত্ররাই এদেশে ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত। উৎসাহের আধিক্যে এঁদের আচরণে ও বলা-কওয়ায়-লেখায় আতিশয্য বা উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না তা নয়। প্রবল বর্ষায় শীর্ণ নদী যখন জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন প্রবল স্রোতের টানে নদীর জল ঘোলা হয়ে যায়, অনেক আবর্জনা নেমে আসে নদীজলে, কিন্তু গতি ও শক্তি যদি থাকে নদী নদীই থাকে। তাঁর সেই জলধারা ও প্রাণ প্রবাহ সমতলের শস্যক্ষেত্রকে উর্বরা করে তোলে, তটবর্তী জনপথকে স্নান ও পানের জল জোগায়। ইয়ংবেঙ্গল

আন্দোলনের গতিপথেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগমন। সময়ের অদম্য আবেগ তাঁর মনে-প্রাণে-আচরণমালায়। ইয়ং বেঙ্গলরা এসেছিলেন তুমুল কালবৈশাখীর মতো। যা কিছু আছে তাকে প্রবল বাত্যাঘাতে নড়িয়ে ও ঝরিয়ে দেওয়ার বিদ্রোহী চরিত্র নিয়ে। তাঁদের অনেকে ভাবতেন সাহেবদের সব ব্যাপারই সর্বোৎকৃষ্ট। তাদের জীবনচর্যায় যা কিছু আছে সব নিতে হবে। তাদের পোষাক, আহার, পানীয়, ভাষা। বলতে লিখতে হলে ইংরেজিতে; পারলে মেম বিয়ে করতে হবে, নিতে হবে তাদের ধর্ম, যেতে হবে তাদের দেশে, এমনকি স্বপ্ন দেখতে হলেও ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল ভূভাগ তো বিলেত। অমরাবতী সেখানেই আছে। মাইকেল তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে সেই অনুসারে চলেছিলেন। যখন তাঁর বয়স ১৯/২০ তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসনের অমোঘ প্রভাবছায়ায় পড়লেন। তাঁর শেকসপিয়ার পড়ানো শুনে, তাঁর সম্পাদিত 'Selections from the British Poets' পড়ে প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থা। মনে মনে প্রায় সাহেব হয়ে গেলেন।

বিয়ে এড়ানোর জন্য ধর্মান্তর

ঘটনাক্রমে এমন সময় ঘনিয়ে এল এক বিপদ। বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাঁর বিয়ে স্থির করলেন এক জমিদার-কন্যার সঙ্গে। ইংরেজি কাব্য-কবিতা পড়ে রোমান্টিকতায় ভরপুর মাইকেলের মন। ভালবাসা ছাড়া পূর্ব পরিচয়হীন এক বালিকার সঙ্গে বিয়ে? এ মেয়ে তো কাঠের পুতুল। এর থেকে রেহাই পাবার কী উপায়? উপায় বার করলেন। বিয়ের জন্য নির্ধারিত দিনের আগে বাড়ি থেকে পালানো ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। এক ঢিলে দুই পাখি! খিদিরপুর ডকে বসে যিনি পাঁড় ইয়ংবেঙ্গলের একজন হিসাবে 'আলবিয়নস্ শোর'-এর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন; খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে সেই বিলেত যাওয়ার রুদ্ধ দরজা খুলে যেতে পারে, আর একটি চরম অপছন্দের দেশি মেয়ে গলায় ঝুলে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে, তার হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মোদ্দা কথা খ্রিস্টধর্মের মহিমায় আপ্লুত হয়ে বাইবেল কথিত প্যারাডাইসে যাবার নিশ্চিত পারানি সংগ্রহ করার জন্য তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেননি। ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকেই তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ; ধর্মীয় কোনও তৃষ্ণা থেকে নয়। বিদ্রোহ যাঁর রক্তে ঘরের মায়া ত্যাগ করা তাঁর কাছে কিছুই নয়। হিন্দু ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা বিশ্বাসঘাতকতা বা খ্রিস্টধর্মের প্রতি ধর্মীয় মোহ থেকে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেননি, তা তাঁর পরবর্তী জীবনচর্যা থেকে স্পষ্ট।

ধর্মান্তর গ্রহণে তাঁর ক্ষতিই হয়েছিল

ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে আসলে তাঁর লোকসানের পাল্লাই ভারি হয়েছিল। ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়েছিল। সম্পন্ন পিতার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। খিদিরপুরে বাড়ি ঢোকা বন্ধ হয়েছিল। হিন্দু কলেজ থেকে বিশপস কলেজে চলে যেতে হয়েছিল। বাবা তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য পুত্রার্থে একের পর এক বিয়ে করেছিলেন। মনের দুঃখে কবে যে মাইকেল তার প্রাণপ্রিয় জননী, বন্ধুবান্ধব, সাধের কলকাতা ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজগামী জাহাজে চেপে বসেছিলেন তা খুব কম লোকই জানত। সে প্রসঙ্গ থাক।

শুধু ধর্মান্তরটা দেখলে হবে না, পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে অগ্নিবুভুক্ষু পতঙ্গের মতো মাইকেলের এই প্রধাবন ও সেই সূত্রে অনিশেষ অর্জনে আখেরে লাভ হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের। তিনি রুটিন করে শিখেছিলেন গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, ইতালিয়, জার্মান; ইংরেজি তো ছিলই। গ্রিক 'ইলিয়ড', 'ওডিসি'; লাতিন ঈনিড, ইতালীয় 'ডিভাইন কোমেডিয়া', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট',

তাসোর 'জেরুজালেম দি লিবার্টি', পেত্রার্কের সনেট, ওভিডের পত্রকাব্য, শেকসপিয়ারের 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো' পাঠের সুফল শেষ পর্যন্ত জমা পড়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধুচক্রে। তিনি তো বলেইছেন — কবির চিত্ত ফুলবন মধু' নিয়ে রচনা করবেন মধুচক্র —

'গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন, বিভাষা থেকে স্বভাষায় ফেরা

প্রথম জীবনে স্বপ্ন দেখতেন ইংরেজিতে কাব্য লিখে অমর হবেন — মিল্টনাদি খ্যাতনামা ইংরেজি কবিদের পাশে বসবেন। কিন্তু নানা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তিনি একদিন ফিরে এলেন মাতৃভাষায়। প্রবাস থেকে এই প্রত্যাবর্তনের এই তালফেরতা ইতিহাস শুধু মাইকেলের ব্যক্তিজীবনের কাহিনি নয়। সময় পাল্টাচ্ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের উন্নার্গগামিতা একদিন ক্ষীণ হয়ে এল। বেজে উঠল ঘরে ফেরার সারিগান। তাতে সামিল হলেন মাইকেল। সংস্কৃত পড়া প্রাচ্য পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হলেন তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। কারণ তখন বুট-হ্যাট-পরা ইংরেজিওয়ালা মাইকেল এবং ধুতি-উড়ুনি-পরা সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছাকাছি আসার সময়। তখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। যিনি ইংরেজি কাব্য লিখে ইংরেজ কবি হবেন ভেবেছিলেন তাঁর মোহভঙ্গের সময়। বন্ধুত্বের সৌজন্যে একটি বাংলা নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মূলের দারিদ্রে বিরক্ত হয়ে নিজেই লিখে ফেললেন একটি বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন প্রভূত সমাদর। মাইকেল লিখলেন,

'আমি যে সহসা এতটা সাফল্য লাভ করব এ আমার স্বপ্নের অগোচর। 'শর্মিষ্ঠা' আমাকে বাংলার সেরা লেখকদের প্রথম সারিতে বসিয়ে দিয়েছে।... Now I have got the taste of blood.'

তিনি বুঝতে পারলেন, বাংলা ভাষাই তার স্বক্ষেত্র। বন্ধু গৌরদাস বসাক কে লিখলেন,

'ভাই সত্য বলিতেছি, আমাদের বাংলা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে ইহা মার্জিত হওয়া চাই মাত্র।... এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়।'

'বঙ্গভাষা' কবিতায় আছে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি —

'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; —
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
.... পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।'

মাইকেল বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সাংঘাতিক সময়ের কুশীলব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল মণি। দান্তে সম্পর্কে যেমন বলা হয় তাঁর কাব্য 'voice of ten silent centuries', মাইকেল সম্পর্কেও তা বলা চলে। বহুকাল ধরে স্তম্ভিত হয়ে থাকা বাঙালির বিপুল প্রাণশক্তি তাঁর অমিত কবিপ্রতিভার বসন্তবৃক্ষে যেন অকস্মাৎ মঞ্জরিত, পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের

কবিতা'র সেই প্রহর দৃশ্য যখন

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত'

দেখালেন বাংলা একটা মহাভাষা

প্রতীচ্য-বিদ্যার-বাতায়ন-উদঘাটন-করা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও এসেছিলেন বলেই বাংলার মনন বিশ্বে উঠেছিল বিদ্রোহের ঝড়। আর সেই নব্য বঙ্গ আন্দোলনের পথ ধরে বিশ্ববিদ্যার কর্ষণ ও আকর্ষণ করতে করতেই অবশেষে মাইকেলের মতো মহাপ্রতিভার আবির্ভাব। মাইকেল এসেছিলেন বলেই অর্ধশতকের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল, প্রস্ফুটিত হয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্র প্রতিভার স্বর্ণ শতদল। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, দুঃখের-ভ্রান্তির উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে মাইকেল তাঁর সাফল্যের তরী বাংলার সাহিত্য বন্দরে পৌঁছে না দিলে আমরা কি জানতাম বাংলা একটা মহাভাষা। মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান। মাইকেলই প্রথম আমাদের জানিয়েছিলেন সে কথা।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক।